কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 28 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...২... ......

নারীশিক্ষার সামাজিক প্রভাব

মনোভাবে ইতিবাচকতা আরো বাড়ুক

আমাদের সমাজে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন ঘটছে। অনেক দিন ধরেই প্রক্রিয়াটি চলছে। সব বিষয়ে না হলেও কিছু বিষয়ে এই পরিবর্তন ইতিবাচক। যেমন নারীশিক্ষা। এ বিষয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচকতা বাড়ছে। এক প্রজন্ম আগেও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার উল্লেখ করার মতো ছিল না। এখন শিক্ষিত নারীদের গৃহস্থালি ভিন্ন অন্য কর্মে নিয়োজিত হওয়ার হার ও কর্মবৈচিত্র্য অনেক বেড়েছে। আয়োজিত বিয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষিত মেয়েদের কদর বেড়েছে। কম লেখাপড়া জানা অনেক ছেলেও এখন তার চেয়ে বেশি শিক্ষিত মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেতে আগ্রহী।

সরকার পরিচালিত 'বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ ২০১৬'-র তথ্য-উপাত্তে এমন চিত্রই ফুটে উঠেছে। জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিবাহিত নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার ছয় বছরের ব্যবধানে দ্বিগুণ এবং ১৬ বছরের ব্যবধানে তিন গুণ হয়েছে। ১৫-৪৯ বছর বয়সের বিবাহিত নারীদের মধ্যে অশিক্ষিতের হার ২০০১ সালে ছিল ৪৭ শতাংশ, ২০১০ সালে তা ৩৪ শতাংশে এবং ২০১৬ সালে ২১ শতাংশে নেমে আসে। একই বয়সের নারীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ২০০১ সালে ছিল ২৮ শতাংশ এবং ২০১০ সালে ছিল ৩০ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা বেড়ে ৩২ শতাংশে দাঁড়ায়। ন্যূনতম মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীর সংখ্যাও বাড়ছে। ১৫-৪৯ বছর বয়সের বিবাহিত নারীদের মধ্যে ন্যূনতম মাধ্যমিক শিক্ষার হার ২০০১ সালে ছিল ২৫ শতাংশ। ২০১০ সালে তা ৩৬ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ৪৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০১ সালে অশিক্ষিত বিবাহিত নারীর যে হার ছিল ২০১৬ সাল পর্যন্ত তা ২৬ শতাংশ কমেছে। ন্যূনতম মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিতের হার গত ১৬ বছরে বেড়েছে ২২ শতাংশ।

জরিপটি স্বাস্থ্য খাত সংশ্লিষ্ট হলেও এতে নারীশিক্ষার সাধারণ চিত্র রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সরকার নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন এবং বাল্যবিয়েবিরোধী যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে সেসবের ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। এসবের ফল শুভ। শিক্ষিত নারী নিজের ও সন্তানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে, কম বয়সে বিয়ে বা সন্তান ধারণের বিপদ সম্পর্কে জানতে-বুঝতে পারে। তারা সন্তানের যত্ন নেওয়া ও তাদের শিক্ষিত করায় বেশি মনোযোগ দিতে পারে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটায় ছেলেরাও বুঝতে পারছে, স্ত্রীর শিক্ষিত হওয়া খুবই জরুরি। তারা এখন শিক্ষিত মেয়েকেই বেছে নিতে চায়। ধাপে ধাপে নারীশিক্ষাকে অবৈতনিক করা, বৃত্তির প্রবর্তন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ানো, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নীতিমালা প্রণয়ন, উৎসাহ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রভৃতি সরকারি উদ্যোগ ও বেসরকারি পর্যায়ের কার্যক্রমের ফলে এসব অর্জন সম্ভব হয়েছে। শিক্ষার হার বাড়ায় বিভিন্ন কুসংস্কার দূর হয়েছে। নারীদের আত্মমর্যাদা বোধও বেড়েছে। এই ইতিবাচক দিকগুলোর আরো প্রসার দরকার। সে জন্য সাধারণ ও সচেতনতামূলক শিক্ষার কর্মসূচি সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে অব্যাহত রাখতে হবে।